কৃষি নীতি পত্র

বাংলাদেশ

AGRICULTURAL POLICY BRIEF

BANGLADESH

বর্ষ:১ সংখ্যা: ৩ ডিসেম্বর ২০০৬

কৃষিজ রূপান্তর, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও শস্য বাজারজাতকরন

ভূমিকা

কৃষির প্রবৃদ্ধির জন্য শস্য আহরণ, গুদামজাতকরণ, বিতরন এবং বাজারজাতকরন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত এবং সময়মত নির-বিচ্ছিন্নভাবে কৃষি উপকরন, উৎপাদিত পন্য ও সেবা ভোক্তাদের মাঝে পৌছে দেওয়ার জন্য শস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। শস্য বাজারজাতকরন কেবল কৃষি পণ্য বিতরণকেই বুঝায় না বরং এটি নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে (Abbott: 1987)। শস্য বাজারজাতকালে কৃত্রিমভাবে মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রভাবিত করে থাকে যদিও তারা কৃষির উৎপাদনে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না। এ অপ্রয়োজনীয় মধ্যস্বত্বভোগীরাই কৃষকদের জন্য পন্য বাজারজাতকরনের ক্ষেত্র তৈরী করে দেয় এবং কৃষকরা উক্ত সৃষ্ট পথেই পণ্য বিক্রি করতে অনেকটা বাধ্য হন। এ ভাবেই মধ্যস্বত্বভোগীদের তৈরী করে 'মূল্য শৃঙ্খল (value chain)এ কৃষকদের ভাগ্য আটকে থাকে।

দেশের প্রধান প্রধান কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারনে পর্যাপ্ত পরিমান প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো না থাকায় কৃষকরা প্রায়শই শস্যের ন্যায্য দাম পান না এবং তাদের দরকষাকষির সুযোগ থাকে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের তৈরী এই মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার বাহিরেও আরো বেশ কয়েকটি উপাদান কৃষকদের ন্যায্য দাম পেতে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। কৃষকরা বাধ্য হন ফসল ওঠার সময়েই বিক্রি করতে যখন শস্যের দাম থাকে সর্বনিম্ন। নিভৃত পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা শস্যের বর্তমান প্রকৃত বাজার দর এবং দরের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞই থেকে যান।

আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বাণিজ্য নীতি কৌশলও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব বাণিজ্যের বর্তমান স্থপতি 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতিকূলে কাজ করে যাচ্ছে। WTO এর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বাণিজ্য উদারীকরন, ভর্তুকিহ্রাসের কারণেও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকরা বিপদের মধ্যে পড়েছে।

এ নীতিপত্রে বাংলাদেশের শস্য বাজারজাতকরনের নানান দিক তুলে ধরা হয়েছে এবং একই সাথে চেষ্টা করা হয়েছে কি করে কৃষকদেরকে মূল বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। একই সাথে এই নীতিপত্রটিতে বাংলাদেশের কৃষি পণ্য বাজারে WTO এর ভূমিকাকেও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

কৃষি পণ্যের বাজার অবকাঠামো এবং বাজারজাতকরণের ধারা

বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় ১৯৬০'র দশকে যখন থেকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু হয়। কারণ এ সময় পল্লী অঞ্চলের সাথে প্রথম শহরাঞ্চলের চলাচলের রাস্তা তৈরী হতে থাকে। কিন্তু ১৯৭০'র দশক পর্যন্ত এটি ছিল মধ্যম মানের। সত্তরের দশকের পর বাজার সম্পর্কিত কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে যার মধ্যে অন্যতম হলো উৎপাদনের উলেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং পণ্য প্রক্রিয়াকরণ। ফলশ্রুতিতে, শস্য খাতের বাহিরে কৃষির অন্যান্য খাতেও কারিগরি, আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তাও বাড়তে থাকে। ১৯৮০'র দশকে হাস-মুরগী পালন, গবাদি পশুর খামার তৈরী হতে থাকে (মুহাম্মদ: ২০০৫) এবং দেশের উপকূল অঞ্চলে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হয়।

দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ঋণের সাথে সংযুক্ত হওয়াও বাজার কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার কারণে গ্রামে ক্ষুদ্র অ-কৃষি কাজে যেমন: ছোট দোকান, রিক্সা/ভ্যান চালনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই কারণে নারীদের বাজারে সম্পর্কিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে শস্যের বৈচিত্র্য ছিল। এমনকি ধানই উৎপাদিত হতো বহু রকমের। সবুজ বিপ্লবের ফলে ইরি(IRRI) ধান হয়ে উঠল দেশের প্রধান ফসলে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির কারনে কৃষকদের বাজার সম্পৃক্ততা বাড়াতে লাগলো। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হলো এবং সম্প্রসারিত হলো কৃষি ঋণ বাজার। নতুন সৃষ্ট হলো রাসায়নিক সার, কী-

উন্নয়ন অন্বেষন
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

উন্নয়ন অন্বেষণ/দি ইনোভেটরস
বাড়ী # ১৯এ, সড়ক # ১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: + (৮৮০-২) ৮১৫ ৮২৭৪, ৯১১ ০৬৩৬, ফ্যাক্স: + (৮৮০-২) ৮১৫ ৯১৩৫
ই-মেইল: info@unnayan.org, ওয়েব: www.unnayan.org

টনাশক এবং সেচ যন্ত্রের বাজার। তাছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সবজি চাষ কৃষি পণ্যের রফতানী বাজারকে সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে থাকলো। বেশ কিছু বেসরকারী সংস্থা তৈরী হলো কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যান শস্য (horticulture products) তৈরী ও রফতানীর জন্য। সরকারী উদ্যোগে তৈরী হর্টিকালচার রফতানী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন(Horticulture Export Development Foundation) রফতানী বহুমুখীকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে লাগলো।

অভ্যন্তরীন পণ্য বাজারজাতকরণে 'সুপার মার্কেট' স্থাপন সম্প্রতিক সংযোজন। অর্ধ দশক আগে মাত্র সুপার মার্কেট তৈরী হলেও অতি দ্রুত এর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে ঢাকা শহরেই ২২ টির মতো 'সুপার মার্কেট' চালু আছে যার সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। এই সব সুপার মার্কেটগুলো কৃষকদের ফসল শহরের মধ্যম ও উচ্চ শ্রেণীর ভোক্তাদের কাছে সরাসরি পৌছে দিচ্ছে। তবে এখনও সুপার মার্কেটের মাধ্যমে বাজারজাতকরনের পরিমান খুব বেশী নয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)'র বাণিজ্য চুক্তি, বাণিজ্য উদারীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা

অর্থনীতিতে বাণিজ্য উদারীকরনের প্রভাব নিয়ে দু'ধরনের মতামত রয়েছে। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তার উপর বাণিজ্য উদারীকরনের প্রভাব দেখতে পাই কেনিয়ার Nyangiti এর গবেষণা থেকে। " বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি, বাণিজ্য উদারীকরণ ধনীদেরকে বেশী সুবিধা করে দিয়েছে আর বেশীর ভাগ দরিদ্র্যদের ফেলে দিয়েছে অধিকতর খাদ্য ঝুঁকির মধ্যে" (Madeley:2000)।

কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রম (Structural Adjustment Programme (SAP)) এবং WTO এর কৃষি চুক্তির (AoA) আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে খাদ্য ও কৃষি নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনয়নের শর্ত দেওয়া হয়। দেশগুলো খাদ্য আমদানীর জন্য আভ্যন্তরীন বাজার খুলে দেওয়ার এবং ভর্তুকি হ্রাস করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। SAP রাষ্ট্রায়িত সংস্থাগুলোকে বেসরকারী, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভর্তুকি প্রত্যাহারের শর্ত দেয়। অপর পক্ষে AoA জোর দেয় স্বল্পোন্নত ৪৮ টি দেশ ব্যতিত সকল দেশের বাণিজ্য উদারীকরন এবং খাদ্য আমদানীতে শুল্ক হ্রাসের মতো বিষয়গুলোর উপর।

WTO এর বাণিজ্য আলোচনা এবং কৃষি বাজার উদারীকরণ সংশ্লিষ্ট টি বিষয় যথা: (ক) বাজারে প্রবেশ (খ) আভ্যন্ড্রীণ সহায়তা এবং (গ) রফতানী ভর্তূকি আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে।

শুল্ক স্তরের সংখ্যা কমিয়ে আনা, শুল্ক হ্রাস, একই ধরণের পণ্যের জন্য অনুরূপ বিধানসহ বাংলাদেশের শুল্ক কাঠামোকে সহজিকরণ করা হয়। এখনো বাংলাদেশে শুল্ক হার উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো থেকে বেশী (Congressional Budget Office, November, 2006)। বাংলাদেশের মোট এএমএস খুবই কম। যার

চিত্র ১: গড় বার্ষিক অভ্যন্তরীন সহায়তা, ১৯৯৮-২০০৫ (% মোট কৃষি উৎপাদন)

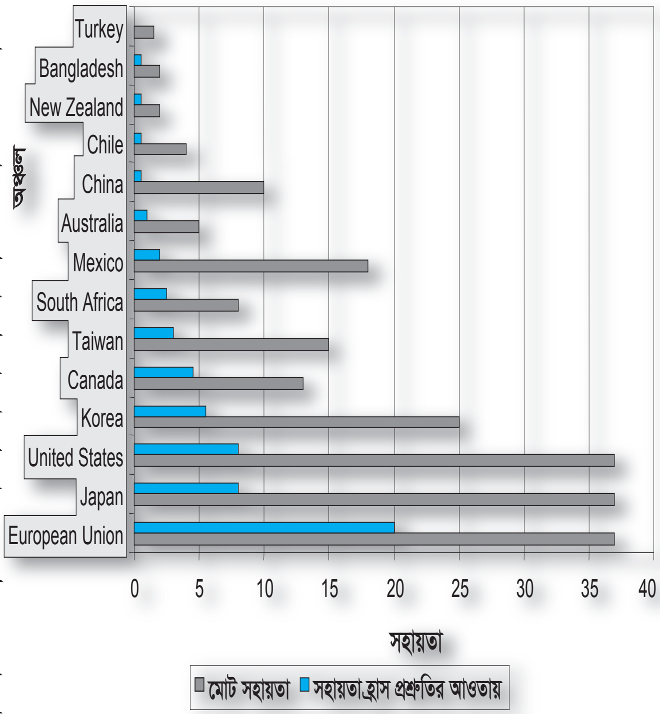

উৎস : *Agricultural Trade Liberalization, CBO, A series of issue summaries from the Congressional Budget Office, November, 2006*

পরিমান মোট কৃষি উৎপাদনের মাত্র ৩.৫%। এমনকি WTO চুক্তির আওতায়ও বাংলাদেশে অভ্যন্তরীন সহায়তা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। নীচের চিত্রে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশ কর্তৃক প্রদত্ত অভ্যন্তরীন সহায়তার তুলনামূলক অবস্থা তুলে ধরা হলো। চিত্রে এটি খুবই স্পষ্ট যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অভ্যন্তরীন সহায়তা খুবই কম।

চিত্রে সহায়তা হ্রাস প্রতিশ্রুতি বলতে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক উরুগুয়ে বাণিজ্য আলোচনার সময় প্রদত্ত 'হলুদাভ বাদামী বক্স (amber-box)' এর সহায়তা হ্রসকে বুঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশে কৃষির মধ্যে ধান উৎপাদন খাতে সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীন সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আর এ সহায়তা দেওয়া হয়েছে উকরণ ভর্তুকি, উৎপাদন মূল্য সহায়তা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা খাতে। ধান উৎপাদনখাতে সহায়তার শুরু হয় ১৯৬০'র দশক থেকে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)) সার, বীজ ক্রয় ও বাজারজাতকরনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। ১৯৮০'র দশকের প্রথম দিক থেকে তাদের এ ভূমিকা হ্রাস করা হতে থাকে এবং বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় (Razzaque,M. A, Laurent E, 2008)।

১৯৯২ সাল থেকে বেসরকারী খাতে সার ক্রয়, আমদানী ও

চিত্র ২: জাতীয় পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতি (ভিত্তি: অর্থবছর ৯৬=১০০)

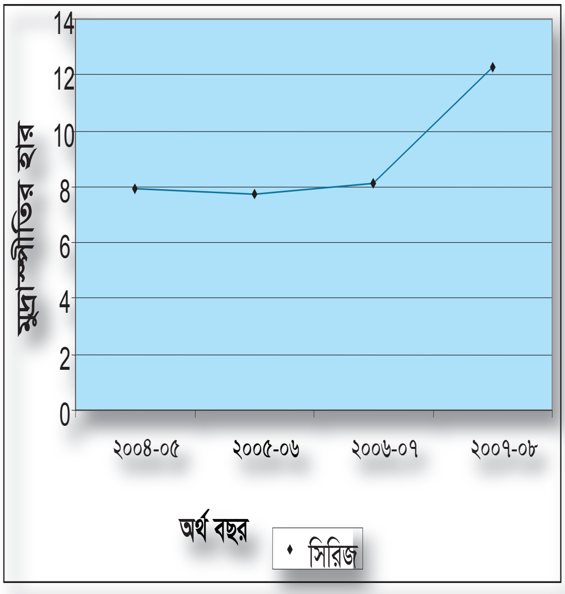

উৎসঃ *Bangladesh Bank, Monthly Update, June 2009*

অভ্যন্তরীন বাজারে বিতরনের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি

দারিদ্র এবং কল্যাণের উপর ধান ও কৃষি বাণিজ্য উদারীকরনের প্রভাবের উপর জনাব সেলিম রায়হান এবং ড. এম এ রাজ্জাক কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা যায়, বিশ্ব বাজারে ধান বাণিজ্য উদারীকরণে বাংলাদেশের কৃষকদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ও কল্যাণের হ্রাস পেয়েছে।

২০০৭ সালের প্রথম দিকে বিশ্ব বাজারে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে দরিদ্র পরিবারগুলোর পক্ষে খাদ্য ক্রয়সহ জীবন-যাপন অত্যন্ড় কঠিন হয়ে পড়ে। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, জানুয়ারি ২০০৭ থেকে মার্চ ২০০৮ এর মধ্যে দরিদ্র পরিবারগুলির আয় ৩৬.৭% হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতির কারনে ২.৫ মিলিয়ন পরিবার দরিদ্র সীমার নীচে নেমে যায়।

বিগত দু'টি বৎসরে বিশ্ব বাজারে খাদ্য শস্যের দাম বাড়তেই থাকে এবং পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী সীমাহীন কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়। সারণি-১ খাদ্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি দেখানো হলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বাংলাদেশে খাদ্য শস্যের দাম ক্ষেত্রবিশেষে ৪ থেকে ৮৪% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

টিসিবি এবং বাংলাদেশ কনজিউমারস এসোসিয়েশনের হি-সাবমতে ২০০১ সালের শেষ নাগাদ পর্যন্ত মোটা চালের দাম বেড়েছে ১০৮% এবং জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে ৬৭%

সারণি ১: খাদ্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি

পণ্য	২০০১ (বছর শেষ গড়)	২০০৭ (জানু'১১)	২০০৮ (জানু' ১১)	২০০৯ (জানু' ৫)	মূল্যবৃদ্ধি (%)
মোটা চাল (ইরি)	১৩.৫	১৮.৫	৩১.০	২৮.০	২০৮.০
চিকন চাল(নাজিরশাইল)	১৮.৫	২৪.০	৪১.০	৩৮.০	১০৬.০
আটা	১৩.০	২৫.৫	৪১.০	২৬.০	১০০.০
সয়াবিন তেল	৪০.০	৬৫.০	৯৬.০	৯১.০	১২৭.০
পিয়াজ	২০.০	১৮.০	১৮.০	৩৩.০	৬৫.০
চিনি	৩৪.০	৩৬.৫	২৯.৫	৩২.০	৬.০
লবন	১০.০	১৩.০	১৩.০	১৭.০	৭০.০
মসুরের ডাল	৩৯.০	৬৫.০	৭২.৫	৯০.৫	১৩২.০
আলু	৮.৫	১৮.০	১৪.০	২০.০	১৩৫.০

উৎসঃ *Trading Corporation of Bangladesh (TCB) and Consumers Association of Bangladesh, January, 2009.*

আমদানীর উপর ক্রমাগত নির্ভরশীলতা

বাণিজ্য উদারীকরনের ফলে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ওয়েটেড আমদানী শুল্ক যেখানে ১৯৯৩ সালে ছিল ২৩.৬ তা ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে হ্রাস পেয়ে হয় মাত্র ৬.৯৮% এবং নন ওয়েটেড শুল্ক যথাক্রমে ৪৯% থেকে হ্রাস করে প্রায় ১৩% নির্ধারণ করা হয় একই সাথে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্যের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯১-৯৩ আমদানী নীতিতে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্যের সংখ্যা ছিল ১৯৩ টি আর ২০০৩-০৪ সালের আমদানী নীতিতে সংখ্যা হ্রাস করে করা হয় মাত্র ৬৩টি (Ahmed M Iqbal, 2008)। আর আমদানীর বেশীর ভাগই করা হয় ভারত এবং চীন থেকে। অধিকন্তু আমদানী খরচ বৃদ্ধি পায় ভারতের রুপি এবং চীনের ইউয়ানের মান বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশী মুদ্রা টাকার মান কমে যাওয়ায়। সারণি ২ তে ভারত ও চীন থেকে আমদানীর পরিমান দেখানো হলো:

নীতি পদক্ষেপ ও সরকারী পরিকল্পনায়

জানুয়ারি ২০০৯-এ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই খাদ্য মূল্য কমানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ক্ষেপ গ্রহণ করে। কৃষকদের জন্য কৃষি উপকরনের প্রবেশাধিকার সহজ করে। সার ও জ্বালানীর মূল্য হ্রাস করে দেয় যাতে করে বোরো ধানের উৎপাদন খরচ কমে যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বাজার মূলত মধ্যস্বত্বভোগকারীদের নিয়ন্ত্রণে যা কৃষক বা ভোক্তা কারোরই অনুকূলে নয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান কৃষি দফরগুলোর মধ্যে কৃষি বাজারজাতকরন দপ্তরটি (Department of Agricultural Marketing (DAM)) সবচেয়ে দুর্বল। ১৯৯৯ সালের কৃষি নীতি তে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উক্ত নীতি অনুযায়ী DAM কে পুনর্গঠনসহ

কৃষি পণ্য মূল্য নির্ধারণ কমিশন স্থাপন করার কথা।

সারণি ২: ভারত ও চীন থেকে বাংলাদেশে আমদানী (মিলিয়ন ইউএস ডলার)

বৎসর	ভারত	চীন
২০০২-০৩	১৩৫৮	৯৩৮
২০০৩-০৪	১৬০২	১১৯৮
২০০৪-০৫	২০৩০	১৬৪২
২০০৫-০৬	১৮৬৮	২০৭৯
২০০৬-০৭ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	১৪০২	১৭৫৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য গুদামের মাধ্যমে সংরক্ষণ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণেরও কৌশল ধার্য করা হয়েছিল। বাজার তথ্য পদ্ধতিকেও শক্তিশালী করার লক্ষ্য ছিল। পল্লী কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। কিন্ত বাস্তবে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়নি।

ক্রমাগত খাদ্যের দাম বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমাগত আঘাত ইত্যাদি কারণে নীতি নির্ধারকরা কৃষি নীতি পর্যালোচনা শুরু করে। ২০০৮ সালে নতুন কৃষি নীতির খসড়া প্রনীত হয়। কৃষকদের যথাযথ মূল্য প্রধান এবং খাদ্য মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে রাখাই ছিল নতুন নীতির মূল লক্ষ্য। কৃষকদের মূল্য এবং ভোক্তাদের মূল্যের তফাৎ হ্রাস করাকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেয়অ হয়। কৃষকদের কাছ থেকে ভোক্তাদের কাছে যেন সহজে পণ্য পৌছতে পারে তজ্জন্য গ্রাম্য বাজার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গুদামজাত করণের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরনের অন্যতম মূল সমস্যা হলো তথ্যপ্রাপ্তি ও অপ্রতিসম তথ্য। খসড়া নীতি অনুযায়ী সরকার কৃষি পণ্যের তথ্য সংগ্রহ করে তা জনগণকে জানিয়ে দিবে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরনে বাজার সমীক্ষাকে উৎসাহিত করা হবে যাতে কৃষক ও ভোক্তা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য শস্য ক্রয়/বিক্রয় করতে পারে। যদি খসড়া নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তবে কৃষি বাজারজাতকরণে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

খাদ্য শস্য ক্রয়

সরকারী খাদ্য শস্য ক্রয়ের মূল্য লক্ষ্যই থাকে কৃষককে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। আর খোলা বাজারে সরকার কর্তৃক বিক্রয়ের (open market sale (OMS)) লক্ষ্য থাকে খাদ্য শস্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো নির্ভত পল্লীর দরিদ্র কৃষক ও জনগোষ্ঠী সরকারের এই সব সুবিধা থেকে বরাবরই বঞ্চিত হয়।

২০০৯ সালে বোরো মৌসুমে বাম্পার ফলন হলেও আশংকা হচ্ছে সরকার ও জনগণ বাম্পার ফলনের সুবিধা ষোল আনা নিতে পারবে না শুধু মাত্র কিছু অসাধূ ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগকারীদের কারনে। মিলারা এবং পাইকারী চাল ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে চাল মজুদ করে রাখে। সরকার বিপুল মজুদ গড়ে তোলার পক্ষে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে এর জন্য সমন্বিতভাবে এবং কঠোর নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে এবং অসাধু মজুদকারীদের বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাসংগিক বিষয়াবলী

বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরন বেশ কয়েক স্ড়র ও প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে হয়ে থাকে। কৃষকরা ফসল বিক্রি করে যে মূল্যে ফসল বিক্রি করে আর ভোক্তারা যে মূল্যে শস্য ক্রয় করে তার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে। বাংলাদেশে বেশীর ভাগ কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের। তাদের উচ্চ মূল্যে কৃষি উকরন ক্রয়ের অবস্থায় নেই। এমনকি তাদের জন্য পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ সুবিধাও নেই। কৃষকদের লাভের পরিমানও ভালো নয়। বাজারে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধির লাভ কৃষকরা পায় না। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়-

- বাজারে শস্যের দাম বৃদ্ধির পুরো সুবিধাই গ্রহণ করে মধ্যস্বত্বভোগীরা। কৃষক কর্তৃক ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে অন্যতম বাধা সৃষ্টি করে এইসব মধ্যস্বত্বভোগীরা। এতে যেমন কৃষকদের আয় বাড়ছে না তেমনি কৃষিরও প্রবৃদ্ধি আসছে এবং ভোক্তরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- অনুন্নত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরন অবকাঠামো এবং অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা।
- গ্রামের বেশীর ভাগ কৃষকই তাদের ফসল স্থানীয় বেপারীর কাছে বিক্রি করে এবং ন্যায্য দর পান না।
- কৃষকদেরকে বাজারে বিক্রির সময় অনেক টাকা খাজনা দিতে হয়।
- বেশীর ভাগ কৃষককেই ফসল কাটার পর পরই বিক্রি করতে বাধ্য হন মহাজন/বেপারীর ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য এবং/অথবা তাদের পারিবারিক খরচ নির্বাহ করার জন্য।
- কৃষকদের শস্য মজুদ রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় তারা ফসল আহরনের পর পরই বিক্রি করতে বাধ্য হন।

উপরের সমস্যা ছাড়াও কৃষি পণ্যের বাজার উদারীকরন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তের কারনে কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, কৃষি ঋণ সুবিধা না থাকা ইত্যাদি কারনে কৃষকদের জীবন-জীবিকায় ঝুঁকি প্রবনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৪নং চিত্রে কৃষকদের জীবিকার উপর কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের অদক্ষতা এবং কৃষি বাণিজ্য আলোচনার প্রভাব তুলে ধরা হলো। চিত্রে দেখা যায় বিশ্ব বাজারে খাদ্য শস্যের দাম বৃদ্ধি, বাজার উদারীকরনের ফলে কৃষকদের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। এটি কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং তাদের জীবন-জীবিকার মান নীচে নেমে যায়।

চিত্র ৪: কৃষকদের জীবিকার উপর প্রভাব

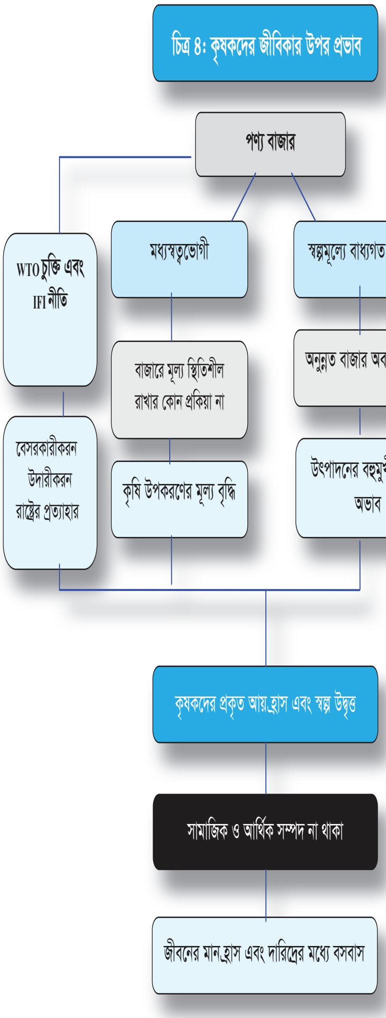

বাজারজাতকরনের মাধ্যম এবং মূল্য শৃঙ্খল

পূর্বের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বর্তমান কৃষি পণ্য বাজার ব্যবস্থা কৃষক অনুকূল নয় এবং কৃষকরা পণ্যের কখনো ন্যায্য মূল্য পান না।

ধান বাজার

বাজার ব্যবস্থায় সাধারনত পণ্য উৎপাদক থেকে ভোক্তাদের নিকট পৌছায়। মধ্যস্থকারীরাই বাজারের চ্যানেলগুলো নির্ধারণ করে থাকে। বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের তুলনামূলক উপযোগী অবস্থা রয়েছে । দেশের প্রধান ফসল হওয়া সত্ত্বেও দেশে এখনো কৃষক অনুকূল ধান বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বর্তমান ধানের বাজারজাতকরন ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পান না। ধানের মূল্য নির্ধারনের সাথে ধানকল মালিকদের দেওয়া ঋণ, ভূস্বামী, ফড়িয়াদের সাথে একটি যেন যোগসূত্র রয়েছে।

বর্তমান ধানের বাজার চ্যানেল উন্নত ও অনুন্নত এলাকায় কেমন তা নিচের চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। চিত্র উন্নয়ন অন্বেষণের পূর্বেকার গবেষণা থেকে নেওয়া। গবেষণাটি দেশের উত্তরবঙ্গীয়

চিত্র ৫: অগ্রসর এলাকায় ধান/চালের বাজার নেটওয়ার্ক।

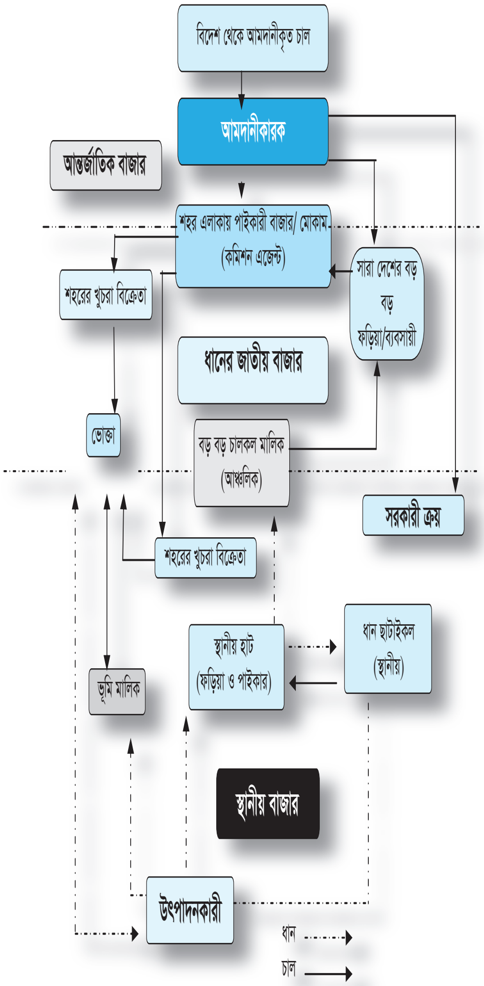

জেলা বগুড়া ও দিনাজপুরের করা। এখনো নীচের বিবৃত অবস্থা বহাল রয়েছে। উৎপাদক কৃষকরা অগ্রসর এলাকায় সরাসরি স্থানীয় বাজারে ধান বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু বর্গাচাষীদের তাদের ফসলের একটি অংশ ভূমি মালিককে দিতে হয়। ধান স্থানীয় ধান ছাটাইকলেও বিক্রয় করা হয়। ছোট ফড়িয়ারা কমিশনের ভিত্তিতে ধান সংগ্রহ করে। বড় চালকল মালিকরা তা ফড়িয়াদের নিকট থেকে ধান গ্রহণ করে। অবশ্য কিছু ফড়িয়া-কাম-পাইকার রয়েছেন যারা চালকলে সরবরাহ দেওয়ার জন্য ধান কিনে থাকে। বড় চালকল মালিকরা তা আবার আঞ্চলিক পর্যায়ের বৃহৎ মিলে ধান সরবরাহ করে থাকে এবং এর কিছু অংশ সরকারী গুদামেও বিক্রি করে থাকে। বেসরকারী ব্যবসায়ী যারা বিদেশ থেকে চাল আমদানী করে তারা তা বড় ব্যবসায়ীদেরকে সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু অনগ্রহসর এলাকায় বর্গাচাষীরাই সংখ্যাধিক্য। কৃষক খুব কম সময়েই ফসল বাজারে সরাসরি বিক্রি করার সুযোগ পায়।

চিত্র ৬: অনগ্রসর এলাকায় ধান/চালের বাজার নেটওয়ার্ক।

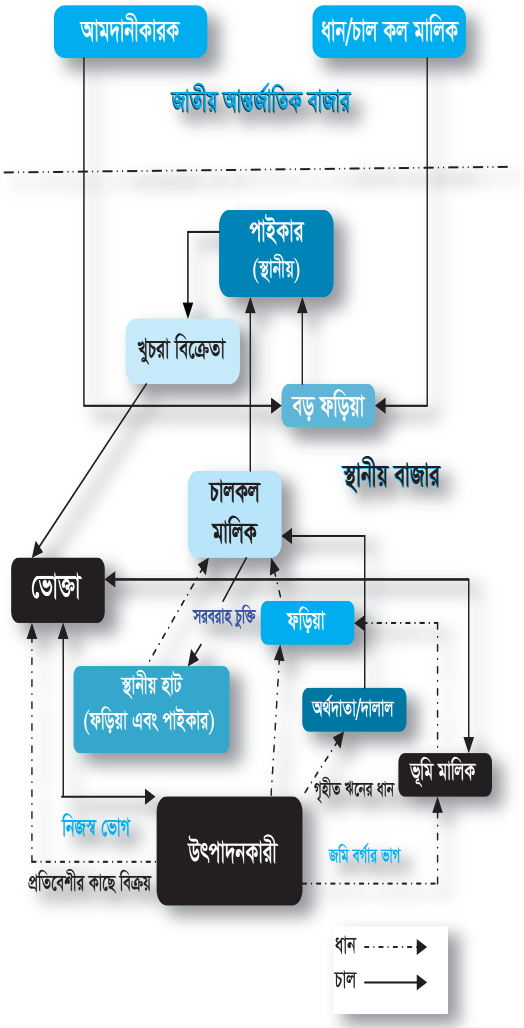

উৎস: *Undercutting Small Farmers, Rice Trade in Bangladesh and WTO Negotiations, Unnayan Onneshan, The Innovators.*

চিত্র-৬ এ অনগ্রসর এলাকার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ধান বিক্রয় হয় ফড়িয়া, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী এবং ধান ছাটাই কলের কাছে। প্রতিবেশীর কাছেও ধান বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এখানে মধ্যস্বত্বভোগীরাই কৃষকদের লাভের মূল অংশ খেয়ে ফেলে। সরকারের ধান/চাল ক্রয় অভিযানের সময়ও এসব কৃষকরা সরকারী গুদামে ধান/চাল সরবরাহ করতে পারে না। সরকারের সুযোগ এখান অবধি এসে পৌছায় না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ফড়িয়া/পাইকার যাদের কাছ থেকে এসব প্রান্তিক কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে ছিল সেই ঋণের শর্ত মোতাবেক তাদের স্বল্পমূল্যে ধান দিতে হয়।

টাঙ্গাইলে মাঠ সমীক্ষা চালানোকালে দেখা গেছে, বেপারীরা কৃষকদের কাছ থেকে ব্রি-২৮ ধান ক্রয় করছে মণ প্রতি ৪৭০-৪৯০ টাকা দাম দিয়ে (যে ধান থেকে পায়জাম/মিনিকেট চাল উৎপন্ন হয়। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ফসল ওঠার সময়, যখন ধানের দাম সবচেয়ে কম থাকে)। বেপারীরা ঐ ধানই চালকল মালিকের কাছে বিক্রি করছে মণ প্রতি ৪৯০-৫১০ টাকা দামে। সরকার আবার ঐ একই ধান চালকল মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করছে ৫৬০-৫৭০ টাকা দরে। আর চালকল মালিকেরা তা ছাটাই করে বড় আড়তে ধান বিক্রি করেন ৫৫০-৫৫৫ টাকায়। চাল বিক্রি হচ্ছে ৯০৪ টাকা দামে। খুচরা বিক্রেতা ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে ৯১৮ টাকায়। আর ভোক্ত কিনছে প্রতি কেজি ২৩ টাকায়। অর্থাৎ বিভিন্ন হাত ঘুরে কৃষকের ধান ভোক্তার কাছে বিক্রি হচ্ছে প্রায় দ্বিগুন দামে।

চিত্র ৭: বিভিন্ন স্তরে মূল্য ব্যবধান

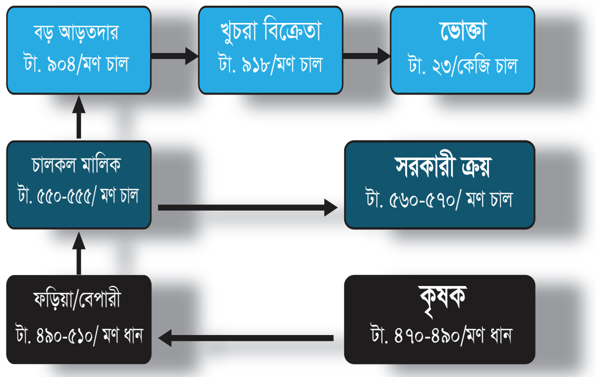

উৎস: মাঠ সমীক্ষা, টাঙ্গাইল, জুন ২০০৯

সবজি বাজার

বাংলাদেশের জলবায়ূ সবজি উৎপাদন উপযোগী। বাংলাদেশে প্রায় ৯০ রকমের সবজি উৎপন্ন হয় যার মধ্যে ৫০% ই উৎপাদন হয় বাণিজ্যিকভাবে। গড় পরতা এ দেশে ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে প্রায় ১.৭৪ মিলিয়ন মে.টন সবজি উৎপন্ন হয় (ডিইএ: ২০০৯)। ১৯৯০ এর দশক থেকে সবজি উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সবজিকে মূলত দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। গ্রীস্মকালীন সবজি এবং শীতকালীন সবজি। তবে বেশীর ভাগ সবজিই হয় শীতকালে। শীতকালীন সবজির মধ্যে রয়েছে ফুলকপি, বাধাঁকপি, ব্রকলি, টমেটো, বেগুন, সীম, মূলা, গাজর, লাউ, শসাসহ বিভিন্ন ধরনের শাক। আর গ্রীস্মকালীন সবজির মধ্যে রয়েছে মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়াসহ বিভিন্ন ধরনের কুমড়াসহ অন্যান্য দেশীয় শাক-সবজি।

বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরন পুরোপুরি এখনো গড়ে ওঠেনি। উৎপন্ন সবজি দেশীয় বাজারে বিক্রি করতে হয় অথবা সতেজ থাকতেই তা রফতানী করতে হয়। সবজি একদিনের মধ্যেই নষ্ট হতে শুরু করে যদি না তা হিমায়িত বা প্রক্রিয়াজাত করে রাখা হয়। সাম্প্রতিককালে বেসরকারিখাত সবজি প্রক্রিয়াজাতকরনে এগিয়ে এসেছে। ফলে এসব সবজির চাহিদা বিশ্ব বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে সবজি স্থানীয় বাজারে পৌছতে কয়েকটি স্তর রয়েছে। এলাকাভেদে সবজি বাজারজাতকরনে পার্থক্য রয়েছে।

সারণি ৩: বাংলাদেশে প্রকৃত সবজি উৎপাদন

অর্থ বছর	আবাদী এলাকা (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
২০০৫-০৬	৬.৩৮	৮৭.৪৫
২০০৬-০৭	৬.৫	৯৩.০৫
২০০৭-০৮	৬.৫১	৮৯.১
২০০৮-০৯	৭	১০০

সূত্র: বাংলাদেশে ব্যাংক কোয়ার্টারলি আপডেট, মে ২০০৯

যেহেতু বিশ্ব বাজারে সবজির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু বেসরকারি উদ্যোগে সবজি রফতানীও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিত্র ৮ ও ৯ কৃষকদের কাছ থেকে রফতানীকারকদের কাচে সবজি পৌছানোর স্ড়রগুলো দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৮ ও ৯: রফতানীকরকদের কাছে বাজারজাতকরন (ক ও

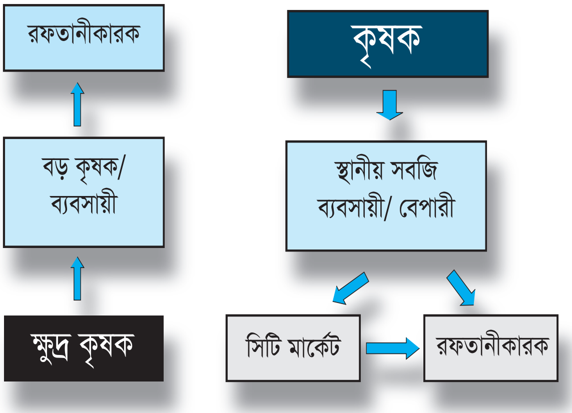

(খ)

সূত্র: হর্টিকালচার উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

চিত্র-৮ এ বিভিন্ন ধরনের লেবু (জারা লেবু, আদা লেবু, সাতকরা ইত্যাদি) ও সবজি (বেগুন, লাউ ও অন্যান্য সবজি) রফতানী প্রক্রিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। সবজি ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছ থেকে সবজি সংগ্রহ করে রফতানীকারকদের নিকট বিক্রয় করেন। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্র কৃষকরা এক হালি (৪টি) জারা লেবু বড় কৃষক/ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করেন ৪০ টাকায় আর বড় কৃষকরা তা রফতানীকারকের নিকট বিক্রি করেন ৬০ টাকায়। বিভিন্ন ধরনের কুমড়া বাজারজাতকরনে বেপারী ও স্থানীয় সবজি ব্যবসায়ীরা মধ্যস্থাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। তারাই প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের কাছ থেকে সবজি সংগ্রহ করে এবং তা রফতানীকারকের নিকট বিক্রি করে থাকে। এই বেপারীরা সংগৃহীত সবজির একটি অংশ শহরের সিটি মার্কেটগুলোতে সরবরাহ করেন এবং এই সিটি মার্কেট থেকেও রফতানীকারকরা সবজি সংগ্রহ করে রফতানী করে থাকে। ক্ষুদ্র কৃষকদের সাথে রফতানীকারকদের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সবজির প্রকৃত মূল্য পান না।

সবজি বাজারজাতকরনে বিদ্যমান সমস্যাগুলো হলো:

- গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। সবজি খুবই দ্রুত বাজারজাত করতে হয়, কিন্তু দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে কৃষকরা সবজি যথা জায়গায় বাজারজাত করতে পারে না এবং প্রকৃত মূল্যও পায় না।
- সবজি রফতানী করতে হলে বেসরকারি কোম্পানীগুলোকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্যান্ট প্রটেকশন উইং থেকে সেনিটারী ও ফাইটো সেনিটারী সনদ (Sanitary and Phytosanitary Certificate (SPS)) দাখিল করতে হয়। উক্ত সনদ একদিনের মধ্যেই সংগ্রহ করতে হবে অন্যথায় সবজি পচে যাবে। কিন্তু উক্ত সনদ একদিনে সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- গ্রামের কৃষকদের কোন শস্য বীমা নেই। সবজি পরিবহনসহ নানান কারনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরূপ ঘটনা ঘটলে কৃষকরা কোন ক্ষতিপূরণ পান না।

অস্থিতিশীল দর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিক্রি (Fluctuation of Price Level and Distress Sale)

কৃষি পণ্য বাজারজাতকরনে একটি মৌলিক সমস্যা হলো অস্থিতিশীল বাজার মূল্য। সবজি আহরনের পর পরই দেখা যায় দাম কমে গেছে এবং পরবর্তীতে আবার সেই সবজি উচ্চ মূল্যে উঠে যায়। গুদামজাতকরনের সুযোগ না থাকায়ই এ রূপ ঘটনার জন্য প্রধানতম দায়ী। সবজিসহ প্রায় সকল ধরনের কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রেই অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার প্রতি বছর নির্ধারিত মূল্যে ধান/চাল ক্রয় করে থাকে। সরকার নির্ধারিত মূল্য সাধারন বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী হয়। নীতিগতভাবে সরকার কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার

বক্স-১: অনাকাঙ্তি বিক্রি (Distress Sale)

কুমিলা জেলার শ্রীমান্তপুর গ্রামের প্রান্তিক কৃষক মোঃ জসিম। ৭ সদস্যের পরিবার। পরিবারের খরচ কুলিয়ে ওঠা প্রায়ই সম্ভব হয় না। কৃষিই একমাত্র জীবিকা। তিনি স্থানীয় একটি এনজিও থেকে সবজি বীজ ক্রয় করেছেন সবজি আবাদ করার জন্য। এনজিওটি যে পরিমান বীজ দিয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ফলে তিনি বাজার থেকে আরো কিছু বীজ ক্রয় করলেন। অনেক পরিশ্রম করে তিনি সবজি উৎপাদন করেছেন। কিন্তু যখন ফসল ঘরে উঠল তখন সবজির দাম অত্যন্ত কমে গেল। যে সবজি তিনি ৬০,০০০ টাকায় বিক্রি করেছেন তা সংরণ করা গেলে তা তিনি তার দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি করতে পারতেন। গত তিন বছর ধরেই একই ঘটনা ঘটছে এবং দিন দিন তার আর্থিক কষ্টের পরিমান বাড়ছে।

সূত্র: মাঠ সমীক্ষা, কুমিল্লা

জন্যই ক্রয় করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষকরা সরকারের এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না (শাহাবুদ্দিন ও ইসলাম: ১৯৯৯)। কারন প্রক্রিয়াটি জটিল এবং সরকারের ক্রয় কেন্দ্রগুলো প্রান্তিক কৃষকদের থেকে অনেক দুরে। সবজি এবং ফলের বাজারে মূল্য অস্থিতিশীলতা তুলনামূলকভাবে একটু বেশী। কৃষকরা ধান/চাল ক্রয় করে সাধারণত ফসলের মৌসুম ফুরিয়ে গেল যখন তাদের মজুদ শেষ হয়ে যায়। তখন বেঁচে থাকার তাগিদে উচ্চ মূল্যে স্থানীয় বাজার থেকে ধান/চাল ক্রয় করতে হয়। মাঠ সমীক্ষার তথ্য থেকে প্রতিপাদ হয় যে, দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকরা যে পরিমান ফসল বিক্রি করে তার ১৩৫% তাদেরকে পরবর্তীতে বেশী ক্রয় করতে হয়। আর বড় কৃষকদেরকে ১৬% এবং মধ্যম কৃষকদের ৩৩% বেশী দরে ক্রয় করতে হয়। কৃষকদের সারা বছরের চাহিদা মজুদ করার মতো শস্য থাকে না অথবা মজুদ করার মতো ব্যবস্থা নেই। কৃষকরা যখন ক্রয় করতে বাধ্য হন তখন বাজার থাকে উচ্চ। যিনি যত ক্ষুদ্র কৃষক তিনি তত বেশী অনাকাঙ্ক্ষিত বিক্রির শিকার হন। ৫৭% ক্ষুদ্র কৃষ, ৪০% মধ্যম কৃষক এবং ২৭% বড় কৃষক অনাকাঙ্ক্ষিত বিক্রির শিকার হন। কৃষকরা ফসল আহরনের পর যে মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হন তা উক্ত ফসলের বার্ষিক গড় মূল্যের চেয়ে ৬% কম (বায়েস ও হোসাইন: ২০০৭)। বড় কৃষকদের সংরক্ষণ সুবিধা ক্ষুদ্র কৃষকদের চেয়ে বেশী।

আবুল বায়েস এবং মাহবুব হোসাইন কর্তৃক ২০০৭ সালের এক গবেষণায় দেখা যায় মাত্র অর্ধেক বর্গাচাষী ফসল নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতে পারে এবং আহরিত ফসলের ২৮% সাধারন বাজার ব্যবস্থায় বিক্রি করতে পারেন। যে সব কৃষকদের নিজস্ব জমি রয়েছেন এইরূপ কৃষকদের ৫৭% আনুষ্ঠানিক বাজারে প্রবেশাধিকার পান এবং তারাও তাদের উৎপাদনের ২৮% বিক্রি করতে পারেন। উভয় কৃষকরাই প্রকৃত গড় মূল্যের চেয়ে ৬-৭% কম মূল্য পান। অবশ্য দিন দিন কৃষকদের আনুষ্ঠানিক বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ছে।

ক্রমবর্ধনশীল উৎপাদন ব্যয়

মাঠ সমীক্ষায় দেখা যায় কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় দিন দিন বেড়েই চলছে এবং প্রকৃত লাভের পরিমান কমে যাচ্ছে। যদিও লাভের পরিমান বছরভিত্তিক উঠানামা করছে। নিচের সারণি ৪ আয়-ব্যয় অনুপাত তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪: শস্য থেকে কৃষকদের আয়-ব্যয় অনুপাত

বছর / শস্য	১৯৮১-৮২	১৯৮৬-৮৭	১৯৯১-৯২	১৯৯৬-৯৭	২০০১-২০০২	২০০৫-২০০৬
স্থানীয় আউশ ধান	০.৯৬	১.০৪	১.০৯	০.৬৬	০.৭৬	০.৬২
উফশী আউশ	১.২৮	১.৩৩	১.৩৬	০.৮২	০.৭৬	০.৮১
এল.টি. আমন	১.৪৯	১.৮৫	১.৪৮	১.০৬	১.০৬	০.৯৬
এম. আমন	১.৪৬	১.৭৯	১.৬৫	১.০৯	১.২৭	০.৯৯
এল. বোরো	১.২২	১.১৩	০.৯৮	০.৬৫	০.৮৩	০.৭০
এম. বোরো	১.৪৪	১.৬৯	১.৩২	০.৯৮	১.০২	০.৮৯
এম. গম	১.৩৩	১.১৪	১.১৬	১.০৯	১.০৪	১.০৭

উৎস: *Failing Farmers 'Liberalization in Agriculture and Farmers' Profitability in Bangladesh, Rashed Al Mahmud Titumir, Golam Sarwar*

সরকার ধরে নিয়েছিল কৃষি বাণিজ্য উদারীকরনে কৃষকরা লাভবান হবেন। কিন্ড়ু বাস্ড়বা বলে উল্টো কথা। উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় ঐ সময় কৃষকদের লাভ বাড়েনি বরং কমেছে। শস্য খাতে লাভ কমে যাওয়ার অন্যতম কারন হতে পারে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া। উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি যতটা না ঘটেছে বাজারের কারণে তার চেয়ে বেশী ঘটেছে বাজার বহির্ভূত কারনে। যেমন- অসাধু ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফার লোভে সার, বীজ ও সেচ উপকরন পুরো মৌসুমের সময় মজুদ করে রাখা, সিন্ডিকেশন এবং অন্যান্য কারন।

বক্স-২: বাজারজাতকরণের অনুগল্প

মোজাম্মেল হক কুমিল্লা'র শ্রীমান্তপুর গ্রামের আরেক দরিদ্র কৃষক। কৃষি পণ্য বাজারজাতকরনে তাদের সীমাবদ্ধতার অন্ত নেই। তার বাড়ির কাছ থেকে কাছের বাজারটি প্রায় ৫/৬ কি.মি. দুরে। তিনি তার ফসল ভ্যানে করে ঐ বাজারে নিয়ে যান। ভ্যানে করে যেতে তার অনেক সময় লেগে যায়। আর জমি থেকে বাজারে যাওয়ার ভ্যান ভাড়া ২০০ টাকা। এক ভ্যান শস্য বাজার নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে তার খরচ পড়ে প্রায় ১০০০ টাকা। তার জন্য এই টাকার অংকটি বিশাল। শস্য বাজারজাতকরনের কথা বলতে গিয়ে বেশ আপে করে বললেন, "কখনো কখনো বাজারে গিয়ে ফসল বিক্রি করার জন্য কোন বেপারী (মধ্যস্বত্বভোগী/স্থানীয় পাইকারী ক্রেতা) বা ক্রেতা পাই না। তখন বাধ্য হই ফসল বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে বা অতি নিু দরে বিক্রি করে দিতে।"

সূত্র: মাঠ সমীক্ষা

অ-রক্ষিত নারী

১৯৭০'র দশকে আয় বর্ধক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। এনজিও কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ১৯৮০'র দশক থেকে নারীদের নিজস্ব গন্ডি থেকে

বেড়িয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে চিরকালই বাংলাদেশী নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। তারপরও তাদের অবদানকে অর্থ নৈতিক কর্মকান্ডে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। আর দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর কারণে নারীরা সরাসরি বাজারে গিয়ে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারে না। যদিও বর্তমানে এ অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। নারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য পরিবহন ও বিক্রির জন্য পুরুষদের উপরই নির্ভর করে থাকে। নারীরা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য মূলত বেপারীদের উপরই নির্ভর করে বেশী।

কৃষি পণ্য রফতানী

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষি রফতানী খাত কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। বেসরকারী খাতে কৃষি পণ্য রফতানীতে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭০'র দশকে রফতানী পাট খাতের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ১৯৮০'র দশক থেকে রেডিমেড গার্মেন্টস খাতে রফতানী বাড়তে থাকে। গত কয়েক বছর যাবত কৃষি পণ্যের চেয়ে প্রক্রিয়াজাত উপকরণ রফতানী বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার কদাচিৎ রফতানী প্রণোদনা হিসাবে নগদ অর্থ সুবিধা দিয়ে থাকে। সারণি ৫ এ প্রাথমিক পণ্য রফতানীর চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫: প্রাথমিক পণ্য রফতানী ধারা

পণ্য	মোট রফতানী (মিলিয়ন ডলার)			মোট রফতানীর %			প্রবৃদ্ধি		
	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (জুলাই-মার্চ)
প্রাথমিক পণ্য	৮৩২.২৭	৯৮৭.৫৬	৬৫০.৮৯	৬.৮৩	৭	৫.৫৯	৭.৭১	১৮.৬৬	-১৪.৬৭
হিমায়িত খাদ্য	৫১৫.৩২	৫৩৪.০৭	৩৫৫.৬৭	৪.২৩	৩.৭৮	৩.০৬	১২.২৪	৩.৬৪	-১৩.০১
চা	৬.৯৪	১৪.৮৯	১১.৭১	০.০৬	০.১১	০.১	-৪১.৬৩	১১৪.৫৫	-১৩.৩৯
কৃষিজ পণ্য	৮৭.৮২	১২০.১৩	৯৩.৮১	০.৭২	০.৮৫	০.৮১	-১৬.৬৮	৩৬.৭৯	৩.৮
অপ্রক্রিয়াজাত পাট	১৪৭.১৫	১৬৫.০৬	১০২.৮৪	১.২১	১.১৭	০.৮৮	-০.৭৬	১২.১৭	-১৯.৬২
অন্যান্য	৭৫.০৪	১৫৩.৪১	৮৬.৮৬	০.৬২	১.০৯	০.৭৫	৫৬.২৪	১০৪.৪৪	-২৮.৮৬

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৯

প্রাথমিক পণ্য রফতানীর মধ্যে বেশীর ভাগ রফতানী আয় এসেছে হিমায়িত খাদ্য রফতানী করে। কৃষিজ পণ্য রফতানী আয় খুবই কম। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে কৃষিজ পন্য রফতানী আয় প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক। ২০০৮-০৯ অর্থবছরেও কৃষিজ রফতানী আয় অত্যন্ত কম ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের কৃষি খাত কে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ করতে হলে কৃষি খাতে সংস্কার ও সরকারের যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সারণি ৬ তে সবজি এবং তাজা ফল রফতানীর চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি থেকে দেখা যায়, গত কয়েক বছরে সবজি এবং তাজা ফল রফতানী থেকে আয় বেড়েছে। উত্থান-পতন থাকলেও চিত্র ১০ এ দেখা যায় তাজা ফলমূল এবং সবজির মোট রফতানীর পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৬: সবজি এবং তাজা ফল থেকে জাতীয় রফতানী আয়

বৎসর	জাতীয় রফতানী (মে.টন)	মূল্য (মিলিয়ন US$)
১৯৯৯-২০০০	১০,২৭০	১৪
২০০০-০১	৯,৫০৩	১২.৭৯
২০০১-০২	১২,৭৬১	১৫.৩২
২০০২-০৩	৯,৭৯২	১৩.২৪
২০০৩-০৪	১৬,১৪৪	২৪.৭
২০০৪-০৫	২৯,১০০	৪৬.৪১
২০০৫-০৬	১৯,৪৬০	৩৯.৫৯
২০০৬-০৭	১৯,৮০৫	৪০.৫৩
২০০৭-০৮	৩৩,৬২৬	৬৯.১২

সূত্র: বাংলাদেশ হর্টিকালচার উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

চিত্র ১০: তাজা ফলমূল এবং সবজির মোট রফতানী আয়

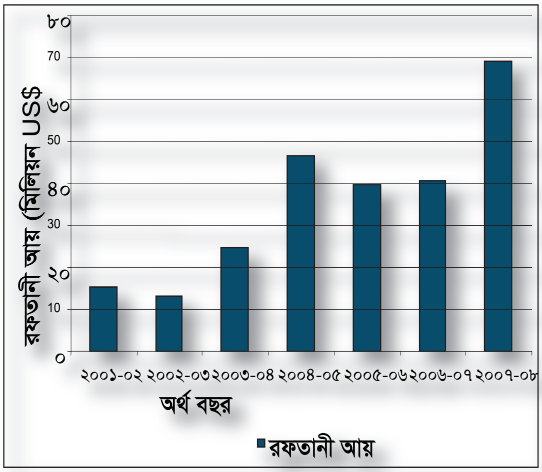

সূত্র: বাংলাদেশ হর্টিকালচার উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

চুক্তিবদ্ধ চাষ (*Contract Farming*)

চুক্তিবদ্ধ চাষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষক ও চাহিদাকারকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রক্রিয়ায় সাধারণত বেসরকারী কোম্পানীগুলো কৃষকদের সাথে নির্ধারিত মান ও পরিমানের নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের জন্য চুক্তি করে থাকে। চুক্তিবদ্ধ চাষে দু'ধরনের মডেল রয়েছে:

(ক) কেন্দ্রিভূত মডেল(Centralized model) এবং
(খ) মধ্যস্থাকারী মডেল(Intermediary model)।

কেন্দ্রিভূত মডেলে কোম্পানী তাদের চাহিত কৃষি পণ্যের জন্য একসাথে অনেক সংখ্যক কৃষকদের সাথে চুক্তি করে থাকে। পক্ষান্তরে, মধ্যস্থাকারী মডেলে কোম্পানী সরাসরি কৃষকদের সাথে চুক্তি না করে মধ্যস্থকারী কারোর সাথে চুক্তি করে এবং মধ্যস্থাকারী চুক্তি করে কৃষকদের সাথে। কৃষি বাণিজ্যি প্রসারের সাথে সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষেরও প্রসার বাড়ছে। এ চাষ পদ্ধতিতে

উদ্যোক্তা কোম্পানীকে নিচের দায়িত্বগুলো পালন করতে হয়:

- উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করা
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- কৃষকদেরকে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান
- কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান

চুক্তিবদ্ধ চাষে কৃষকরা নিম্মোক্তভাবে লাভবা হতে পারে:

- কৃষকরা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি লাভ করতে পারে
- ফসল সরবরাহের সাথে সাথে মূল্য প্রাপ্তি
- উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের মাঝে সেতু বন্ধন তৈরী হয়।

বাংলাদেশে চুক্তিবদ্ধ চাষের স্বরূপ:

একটি কেস স্টাডি কুমিলার শ্রীমান্তপুরের আলী আকবরের মোট ২ একর কৃষি জমি রয়েছে। গত বছর সে ব্র্যাকের সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সে ব্র্যাকের জন্য সীম উৎপাদন করবে। ব্র্যাক উক্ত সীম ইউরোপে রফতানী করে। ব্রাক তার কাছে শুধু বীজ বিক্রি করেছে। যার মূল্যও অত্যন্ত চড়া। কেজি ২০০ টাকা। সার, শ্রম এবং সেচ ব্যয় নিজস্বভাবে নির্বাহ করবে। সে উক্ত বীজ আবাদ করলো। কিন্তু ফলন ভালো হলো না। যখন সে তার সীম ব্রাকের সংগ্রহ কেন্দ্রে নিয়ে গেল তারা তার সীম তিন শেণীতে ভাগ করে ফেললো। উৎকৃষ্ট মানের সীমের জন্য কেজি প্রতি ৬ টাকা মূল্য নির্ধারণ করলো। আর নিকৃষ্ট মানের জন্য দাম ধরল কেজি প্রতি মাত্র ২ টাকা। ঐ মৌসুমে তার পুরো আবাদই তির মুখে পড়লো এবং তাকে লোকসান দিতে হলো প্রায় ৫০,০০০/-টাকা। যদিও ব্রাকের সংগ্রহ কর্মকর্তা বলেছিল নিকৃষ্ট মান বলে চিহ্নিত সীম বাজারে বিক্রয় করার উপযোগী না। কিন্তু ব্র্যাক কর্মকর্তা উক্ত নিকৃষ্ট মানের সীম ঢাকায় পাইকারী বিক্রি করেছিল। ব্র্যাক থেকে বলা হয়েছিল চুক্তি অনুযায়ী সে ব্রাকের কাছে সীম বিক্রি করতে বাধ্য। পুরো ঘটনাটিই ঘটেছে বিনা চুক্তিতে এবং যা এক ধরনের প্রতারণার সামিল।

বাংলাদেশে ব্রাক এবং প্রাণের মতো বড় বড় সংস্থা চুক্তিবদ্ধ আবাদ করিয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদ থেকে কাঙ্খিত সুবিধা পাচ্ছে না। নীচে উদ্বৃত কেস স্টাডিতে তার নমুনা রয়েছে।

প্রাকৃতি দুর্যোগের ঝুঁকি

বাংলাদেশের কৃষি বরাবরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুকির মধ্যে ছিল এবং এখনো রয়েছে। বরং জলবায়ূ পরিবর্তণের কারনে যে ঝুকির পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯74 এবং ১৯৮৭ সাথে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয়েছিল। উক্ত বছরগুলোতে উৎপাদন যথাক্রমে ০.৮ মিলিয়ন মে.টন এবং মিলিয়ন ১.০ মে.টন কম হয়েছে। ১৯৬২-১৯৮৮ সাল পর্যন্ড় শুধু বন্যার কারনে ধানের বার্ষিক উৎপাদন হ্রাসের পরিমান ছিল ০.৫ মিলিয়ন মে.টন। ২০০৭ সালের সিডরে ১০,৫৬৫ বর্গকি.মি এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মোট ৭৮৮,২৯৫ মে.টন আমন ধানের ক্ষতি হয়(গিয়াস উদ্দিন: ২০০৮)।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরনকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বন্যার সময় রাস্ড়াঘাট পানিতে ডুবে থাকে, ফলে পণ্য বাজারজাত করা যায় না এবং শস্য সংরক্ষণও গ্রামে কঠিন হয়ে পড়ে। দরিদ্র কৃষকরা স্বল্পমূল্যে ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমেও কৃষকরা পণ্য পরিবহনসহ বাজারজাতকরণে যথেষ্ট বেগ পান এবং ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন।

উৎপাদন মান(*Product Standard*)

বাজারজাতকরণের জন্য ফসলের নির্ধারিত গুণগত মান ধরে রাখা কৃষকদের জন্য যথেষ্ট কঠিন। অনুন্নত অবকাঠামো, পরিবহন ব্যবস্থা, প্রাকৃতি দুর্যোগ, ফসল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদির কারণে পণ্যে গুণগত মান বহাল রেখে কৃষকরা তাদের পণ্য বাজারে সরবরাহ করতে পারেন না। হিমায়িত খাদ্য, তাজা ফলমূল, শাক-সবজি রফতানীর ক্ষেত্রেও কৃষকদের পক্ষে গুনগত মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। রফতানীকারকরা মধ্যস্থকারীদের মাধ্যমে কৃষকদের ফসল সংগ্রহ করে থাকে। রফতানী উন্নযন ব্যুরোর মতে, এ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩০% ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কৃষি পণ্য রফতানী/প্রক্রিয়াকরণে রফতানীকারক/ প্রক্রিয়াকরণকারীরা নানান প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন।

- পণ্য প্রক্রিয়াকরনকারীরা চুক্তিবদ্ধ আবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। তারাই রফতানীর জন্য শস্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকরণের সকল ব্যয় ও ঝুকি বহন করেন। তাদের পণ্য প্রক্রিয়াকরনের জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি নেই এবং প্রযুক্তি ক্রয়ের মতো আর্থিক সামর্থ্যও অনেকের নেই। প্রক্রিয়াকরণকারী নির্ধারিত পরিমান প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানীকারককে সরবরাহ দেওয়ার জন্য ৫০-১০০% অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য হন।
- শহরের বাহিরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরনের সুযোগ অত্যন্ড় সীমিত। পলী বা উপ-শহর এলাকাতে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নেই বললেই চলে। গড় পরতা এসব এলাকায় দিনে ৫ ঘন্টার বেশী বিদূৎ সরবরাহ পাওয়া যায় না। হঠাৎ করে বিদুৎ চলে গেলে নির্ধারিত তাপমাত্রায় খাদ্য হিমায়িত করা না হলে তা রফতানী উপযোগী থাকে না এবং ফেলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।
- পরিবহন এবং অনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত অপ্রতুল। প্রক্রিয়াকরনকারী থেকে রফতানীকারকের কাছে প্রক্রিয়াজাত পণ্য পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাপমাত্রায় পরিবহন সম্ভব হয় না।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতির ক্রয়, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল। তাছাড়া প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানীর পূর্বে পরীক্ষা করার সুযোগও সীমিত। সবজি এবং তাজা ফলমূল রফতানীর ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা হয়ে দাড়ায়।
- রফতানীকারকরা স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার মান সম্পর্কেও

যথেষ্ট পরিমান ধারণা রাখেন না। তারা প্রায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে রফতানীর পূর্বের টেস্টিং এ উৎসাহী নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

নীতি সুপারিশ

বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরন একটি জটিল বিষয়। কৃষির বেশীরভাগ পণ্যই উৎপাদন হয় দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বারা। তাদের উৎপাদিত ফসলের অনুল্লেখযোগ্য পরিমান বাজারজাত যোগ্য হয়। বর্তমানে দেশে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১৩,০৯৮ টি বাজার রয়েছে। কৃষি বাজারজাতকরণের পুরোটাই সম্পন্ন হয় বেসরকারী খাতে। কৃষি বাজার ব্যবস্থার তথ্য পাওয়া যায় না, দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা ও অদক্ষ বাজার কাঠামোতো রয়েছেই। ক্ষুদ্র কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদান করতে হলে নিম্নের সুপারিশসমূহ সরকার বিবেচনায় নিতে পারে:

❂ পণ্যের কৃষক মূল্য এবং ভোক্তা মূল্যের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়মিত বাজার সমীক্ষা করতে হবে। বাজারজাতকরনের বিভিন্ন স্তর পার হওয়ার পূর্বেই উক্ত স্তরসমুহে মূল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা

❂ কৃষকদেরকে মূল্য তথ্য সম্পর্কে জানা এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মান পণ্যের মূল্য ও বাজার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা। পণ্যের জাতীয় গ্রেডিং সিস্টেম চালু করা।

❂ বাজার তথ্য সরবরাহ পদ্ধতি এমনভাবে সহজিকরণ করতে হবে যেন তা গ্রামের নিরক্ষর কৃষকের কাছে সময়মতো পৌছায় এবং তারা তা বুঝতে পারে।

❂ স্থানীয় বাজারগুলোতে তথ্য ব্যুথ স্থাপন করা যেতে পারে। ফলে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ই তা থেকে উপকৃত হতে পারবে।

❂ কৃষক সমবায় সমিতির আদলে উৎপাদকদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী করা। যারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পণ্য যথাযথ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে।

সংগঠনের কাজ হবে:

❂ কৃষি জমির জন্য সকল উপকরণ যৌথভাবে ক্রয়

❂ কৃষি ঋণ ব্যবস্থাপনা

❂ দরিদ্র কৃষকদের শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা

❂ কৃষি পণ্য আহরণের পর প্রক্রিয়াকরন এবং বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখা

❂ স্থায়ী, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজাে পণ্যের চাহিদা, মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষকদের জন্য তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ, বিশ্লেষন ও ব্যবস্থা গ্রহণ

❂ সরাসরি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন। যেখানে সরাসরি পণ্য বিক্রয় করা হবে।

❂ পল্লী এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। বর্ষা ও প্রাকৃতি দুর্যোগকালে পণ্য পরিবহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা।

❂ স্থানীয় বাজারে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় না করা। গ্রামের বাজারগুলোতে ১০০ টাকার কৃষি পণ্য বিক্রি করলে প্রায় ১০/-টাকা খাজনা দিতে হয় যা অত্যন্ত বেশী। এটি বন্ধ হওয়া উচিত।

❂ নারীদের পণ্য বাজারজাতকরনে সংকট অধিকতর তীব্র। তাদের পণ্য পরিবহণে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে এবং নারী উৎপাদকদের জন্য সংগঠন তৈরীতে সহযোগিতা করা।

❂ সার, বীজ, ডিজেল ও সেচে আভ্যন্তরীন ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশে এখনো আভ্যন্তরীন সহায়তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির অনুমোদিত হারের চেয়েও নিম্ন। কাজেই সরকার সহায়তা বৃদ্ধি করলে কৃষি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

❂ কৃষি পণ্য বাজারে দরিদ্র কৃষকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাকে অধিকতর ক্ষুদ্র কৃষক বান্ধব করা দরকার

❂ বাংলাদেশের উচিত bound rate and regulatory duty'র হার বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের এখনো সুযোগ রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধির মধ্যে থেকেই কৃষির উপর শুল্ক বাড়ানোর কেননা বর্তমানে bound rate ২০০% হলেও প্রায়োগিত শুল্ক খুবই কম।

নীতি ছক এবং এ্যাডভোকেসি এজেন্ডা

ক্ষেত্র	সমস্যা	নীতি
মূল্য পরিবর্তনশীলতা	▪ অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় স্থানেই আন্ত:বাজার মূল্য পরিবর্তন ▪ শস্য আহরণ অনুযায়ী মূল্য পরিবর্তন ▪ কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত	▪ দরিদ্র কৃষকদের জন্য পণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা তৈরী করা ▪ কৃষকদের বাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি পৌছে দেওয়া
মার্কেটিং চ্যানেল	▪ বহু স্তর বাজারজাতকরন ব্যবস্থা ▪ মধ্যস্বত্বভোগকারী কর্তৃক মুনাফা হজম	▪ বাজারজাতকরনে মধ্যস্বত্বভোগকারীদের প্রভাব খর্ব করা
বাজার দক্ষতা	▪ কৃষকদের পণ্য মূল্য নিয়ে দরকষাকষির সক্ষমতা না থাকা ▪ বাজার তথ্য কৃষকদের কাছে না থাকা	▪ কৃষক সমবায়ের আদলে কৃষকদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী করা
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীন বাণিজ্য আলোচনা	▪ কৃষি উপকরণের উপর আভ্যন্তরীন ভর্তুকি হ্রাস হওয়ায় কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন খরচ বেড়েছে ▪ কৃষি চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের বাজার কৃষি পণ্য আমদানীর জন্য উম্মুক্ত হয়েছে। ফলে নিম্নমূল্যের নিম্নমানের চাল বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে যা প্রান্তিক কৃষকদের বাজার প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে দিচ্ছে।	▪ বাংলাদেশের উচিত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে করে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়। ▪ বাংলাদেশের উচিত bound rate and regulatory duty'র হার বৃদ্ধি করা

জাতীয় পর্যায়ে গ্রহীতব্য এজেন্ডা

- অশুভভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মজুদদারীর বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ
- সরকারী ক্রয় পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করা যাতে দরিদ্র কৃষকরা এর সুবিধা পেতে পারে।
- যে সব এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবনতা বেশী সে সব জায়গায় শস্য বীমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা
- পল্লী অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধির আওতায় থেকেই শুল্ক বৃদ্ধি করা

স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহীতব্য এজেন্ডা

- স্থানীয় বাজারে কৃষকদের থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় বন্ধ করা।
- স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারী খাতে শস্য সংরক্ষণে উৎসাহ ব্যঞ্জক কার্যক্রম হাতে নেওয়া
- খোলা বাজারে পর্যাপ্ত সার বিতরণের ব্যবস্থা করা।
- সরকার কর্তৃক উন্নতমানের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া। বেসরকারী সংস্থা থেকে বীজ কিনে কৃষকরা প্রতারিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ

উপসংহার

কৃষির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কৃষি পণ্য বাজারের গুণগত এবং কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন করা জরুরী। দরিদ্র কৃষকরা যাতে তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সেদিকে সরকারের নজর নিতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীরা যেন, কৃষকের পরিশ্রমের লাভ খেয়ে ফেলতে না পারে না নিশ্চিত করা গেলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে মর্মে আশা করা যায়। কৃষি উপকরণের ভর্তুকি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। কৃষি উপকরণ এবং কৃষি পণ্য বাজার গভীরভাবে মনিটরিং করতে হবে যেন কোন অশুভ কালো ছায়া এখানে না পড়ে। দরিদ্র কৃষকদের মান সম্পন্ন জীবিকা নিশ্চিত করতে হলে তাদের কৃষিকে লাভজনক করতে হবে সর্বাগ্রে।

নীতিপত্র (Policy Brief) উন্নয়ন অন্বেষণ (Unnayan Onneshan- The Innovators) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। মূল তত্ত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। মেহরুন ইসলাম চৌধুরী প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদন The agrarian Transition and the Livelihoods of the Rural Poor: Agricultural Output Market অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনুদিত ও সংক্ষেপিত আকারে বর্তমান সংখ্যাটি প্রস্তুত করেছেন ***দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর***। সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন এম নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব, উন্নয়ন অন্বেষণ।

সংখ্যাটি অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল এর সহায়তায় প্রকাশিত। মূল গবেষণাপত্রের ইংরেজী সংস্করণ পাওয়া যাবে www.unnayan.org.

পাদটীকা: তথ্যসূত্রের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মূল গবেষণা পত্রে রয়েছে।

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

উন্নয়ন অন্বেষণ- দি ইনোভেটরস একটি স্বাধীন অলাভজনক নিবন্ধনকৃত ট্রাষ্ট। এর লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন চিন্তা, গবেষণা, এডভোকেসি, সংহতি এবং কর্ম পরিকল্পনা উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখা। স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক দারিদ্র, অন্যায়, লিঙ্গ বৈষম্য এবং পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে সমাধান বের করতে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই বিকল্প গননীতি পর্যবেক্ষণ সংস্থাটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রের গবেষণা দর্শন ও মডেল হচ্ছে বহুমাত্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন।